রাজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা

রাজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রাজা

১

অন্ধকার ঘর

রানী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো, আলো কই? এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না!

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে— তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না?

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে?

সুরঙ্গমা। তা হলে যে আলোও চিনবে না, অন্ধকারও চিনবে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থ ই বোঝা যায় না। বল্ তো এ ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি কোথা দিয়ে বেরোই প্রতিদিনই ধাঁদা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল, যে, এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন?

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা— এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই— আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কী, মা, যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব!

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত— মদ খেত আর জুয়ো খেলত।

সুদর্শনা। তুই কী করতিস?

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল— ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল?

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম— সে পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত?

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদর্শনা। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর, এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না— সবাই যেন কী-একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী! সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রানীমা! সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ঐ এক-রকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অল্প বয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্রিকে আমার সুখদুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্‌খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয় ?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বলব— সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য। যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই— আর মনে হয় এই আমার ঢের— আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝতে পারি নে, তবু শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস তাঁকে দেখবই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই ; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামীরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি আমার স্বামীকে দেখতে কেমন। তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না ; বলেন, 'আমি কি দেখেছি— আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি।' যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায় !

সুরঙ্গমা। ঐ-যে মা, একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া ? কোথায় হাওয়া ?

সুরঙ্গমা। ঐ-যে গন্ধ পাচ্ছ না !

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খুলেছে— তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস ?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা, তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে— আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা, হবে। তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ, সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন 'সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো এই তোমার কাজ', তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম— আমি মনে মনেও বলি নি 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও'। তাই যে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না। ঐ-যে তিনি আসছেন, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু!

বাহিরে গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা—

আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে।
এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।
ভরি লয়ে ঝারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকুলে?
বেঁধেছ কি চুল? তুলেছ কি ফুল?
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে?
ধেনু এল গোঠে ফিরে,
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।
তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা? ও তো বন্ধ নেই, কেবল ভেজানো আছে—একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুকবে না?

গান

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ?
নিশ্বাসবায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন।

যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধুলার ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ!
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এসো বলভরে
এসো এসো গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু ব'লে—
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ।

রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না।

সুদর্শনা। আমি এ ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাই নে— কোথায় দরজা কে জানে। তুই এখানকার সব জানিস— তুই আমার হয়ে খুলে দে।

সুরঙ্গমার দ্বার উদ্‌ঘাটন

[প্রণাম ও প্রস্থান

[রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না]

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে

আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না?

রাজা। কে বললে দেখতে পায়। মূঢ় যারা তারা মনে করে 'দেখতে পাচ্ছি'।

সুদর্শনা। তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না— কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না— তুমি বল কী! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ঐ সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়— আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না এ কী কথা।

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না?

সুদর্শনা। এক-রকম করে আসে বৈকি। নইলে বাঁচব কী করে?

রাজা। কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা। সে তো এক-রকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই-রকম— এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে

যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে— তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু। তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহ-দ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব। আর, যদি না পারি, তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্‌-এক অনেক-দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে; কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর, বসন্তকালে এই-যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই, অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

রাজা। সে ভয়ে দোষ কী? প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি— এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বৈকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ?

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না— ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

সুদর্শনা। বলো বলো, এমনি করে বলো। আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে— যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ? না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর? তোমার গানে সেই অলোকসুন্দরীকে দেখতে পাই— সে কি আমার মধ্যে, না, তোমার মধ্যে? তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও-না! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই? সেইজন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই-যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার— যা আমার উপর ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে

তার কিছুই নেই! তবে এ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা দেখো, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে। কেউ তোমাকে বলে দেবে না— আর, বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী?

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব— লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো— চেয়ে দেখো— আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। কী প্রভু?

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন, কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু!

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে,

জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে—সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জ-বনে।

সুরঙ্গমা। সে লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল— চোখে ধাঁদা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে— তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে! তুমি আমার তেমন রাজা নও। রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
আজি হৃদয়মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।
আজি ফুলের বাসে, সুখের হাসে, আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগলপ্রায়—
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

২

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

তৃতীয়। ঐ-যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সামনে চলে যাও।

[প্রস্থান

প্রথম। শোনো একবার, কথা শোনো! বলে সবই এক রাস্তা! তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

দ্বিতীয়। তা, ভাই, রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো— রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ দেশে উল্টো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না— তবু মানুষও তো ঢের দেখছি। এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

প্রথম। ওহে জনার্দন, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ।

জনার্দন। কী দোষ দেখলে?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই

বুঝি ভালো হল ? বলো তো ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো !

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনার্দনের ঐ একরকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন— রাজার কানে যদি যায় তা হলে ম'লে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো, ভাই, এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই— দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই— রাম রাম !

কৌণ্ডিল্য। সেও তো ঐ জনার্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান— কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল— শাস্ত্রমতে ঠিক ঊনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে— একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ঐ ঊনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়। সে এক বিষম মুশকিল। শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, ঊনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় ঊনপঞ্চাশকে উল্‌টে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও— তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি ! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ !

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা !

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দন বলে কিনা খোলা রাস্তাই ভালো !

[সকলের প্রস্থান

বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে, দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে— হার মানলে চলবে না— আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়ালফুলের রেণু
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে!
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে!
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,

তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি, একদিনও তাকে দেখলুম না, এ কি কম দুঃখের কথা!

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি, কবে কার কথা কাকে বলেছি। ঐ-যে তোমাদের রাহক দাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি? সব তো জান।

দ্বিতীয়। জানি বৈকি, সেইজন্যেই তো বলছি— কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয়। তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ! বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন? কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সামলে বেড়ায়?

বিরূপাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্যেই— তা বেশ, নাই বললেম। আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই। রাজা দেখা দেন না,

সে কথাটা তোমরাই তুললে— তাই তো আমি বললেম, সাধে দেখা দেন না!

প্রথম। ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেলো-না।

বিরূপাক্ষ। তা, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই— তোমরা হলে বন্ধু-মানুষ— (মৃদুস্বরে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই তো বটে। আমরা বলি, ভালো রে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন! কিছু না হোক, একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে 'বেটার শির লেও' তা হলেও যে বুঝি রাজা বলে একটা কিছু আছে। বিরূপাক্ষের কথাটা মনে নিচ্ছে হে।

তৃতীয়। কিচ্ছু মনে নিচ্ছে না— ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে।

বিরূপাক্ষ। কী বললে হে, বিশু, তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি?

বিশ্ববসু। তা বলতে চাই নে, কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না— এতে রাগই কর আর যাই কর।

বিরূপাক্ষ। তুমি মানবে কেন! তুমি তোমার বাপ-খুড়োকেই মান না— এত বুদ্ধি তোমার। এ রাজত্বে রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তা হলে কি এখানে তোমার ঠাঁই হত। তুমি তো নাস্তিক বললেই হয়।

বিশ্ববসু। ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে!

বিরূপাক্ষ। দেখো বিশু, মুখ সামলে কথা কও।

বিশ্ববসু। মুখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই।

প্রথম। চুপ চুপ, এ-সব ভালো হচ্ছে না। আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে? মালাটি কোন্ নিপুণ হাতের গাঁথা?

ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি? কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে?

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকরুনদিদি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখে বটে! পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন?

ঠাকুরদা। ওরে, তোদের ঠাকরুনদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা, কবি কী বলছেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বলছেন—

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে—
ঠাকুরদাদা!
যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে—
ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। আরে চুপ চুপ! এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে!

প্রথম। কেন ধরলুম জান না?—

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে।
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তা হলে শুনতে পেতিস এই ফাল্গুন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি পুরোনো জিনিসমাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগ-রাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে!

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন? চলো আমাদের দক্ষিণ বনে।

ঠাকুরদা। ভাই, আমার ঐ দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশ-বিদেশের লোক এসেছে; সবাই বলছে, 'সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন?' কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ঐটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে। এই-যে অন্য রাজাগুলো তারা তো উৎসবটাকে দ'লে ম'লে ছারখার করে দিলে— তাদের হাতি-ঘোড়া লোক-লশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস—

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,

আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে !
(আমরা সবাই রাজা)

রাজা সবারে দেন মান,
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে !
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে !
(আমরা সবাই রাজা)

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল, তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে, কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে—প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।

বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববসু। এই-যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না !

ঠাকুরদা। এতে রাগ কর কেন বিশু। ওর রাজা কুৎসিত বৈকি, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন! স্বয়ং ওর বাপ-মা'ও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বিরূপাক্ষ। ঠাকুরদা, আমি নাম করব না, কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি যাকে বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই।

ঠাকুরদা। নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো।

বিরূপাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে! একে তো যা না বলবার তাই বলে. তার পরে আবার সেটা প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও-না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও-না।

ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ কোরো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও বেচারা আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিরূপাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখো ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা— নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না!

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

জনার্দন। এই দেখো-না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না— কিন্তু রাজা কোথায়. তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন— কিন্তু এখানে দেখো—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে— হাঁ কি না। রাজাকে দেখেছ কি দেখ নি।

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা-চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা-অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের

মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[সকলের প্রস্থান

বাউলের দল

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো, তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক -পানে।
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা—
শোনা হল না, শোনা হল না—
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই-যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে।
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে।

[প্রস্থান

একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

প্রথম পথিক। ইস, তাই তো! মস্তলোক বটে! লম্বা পা ফেলে চলছেন! কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর নাকি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

দ্বিতীয় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

দ্বিতীয় পথিক। সত্যি নাকি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পথিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে!

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে দেখছ না?

দ্বিতীয় পথিক। ওরে, কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি— একেবারে লাল টক্‌টক্‌ করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

দ্বিতীয় পথিক। না, দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

দ্বিতীয় পথিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর— অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর-গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই-যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে শহর ঘুরে বেড়ালো— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায়, সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেইরকম মেকি রাজা বলতে চাও!

প্রথম পদাতিক। ওহে খুড়শ্বশুর, এবার খুড়শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি কান মলছি, নাকে খত দিচ্ছি— যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে— আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

দ্বিতীয় পথিক। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি, অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি— আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা— যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই, এক ধার থেকে গড় করে যাই— সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী?

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না— দামী জিনিস— বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ঐ-যে আসছেন রাজা। আহা, রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা! যেন ননির পুতুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে?

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো— কী জানি ভাই, হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁদা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান

আর-একদল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে, রাজা রে, রাজা! দেখবি আয়।

দ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তের নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি। লোকের কারো কথায় কান দিই নি— আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে— তখনো কাক ডাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায়! রাজা,

আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর— এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে ?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

[প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না— ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

দ্বিতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্, একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্। আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তাল-পাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে!

মাধব। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে— ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

মাধব। ওহে, রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না ? এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। না হে না, রাজারা বোঝে না কিছু— হয়তো ঐ তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে ?

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল— একজন না, দুজন না, রাস্তার দু ধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার

লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কি!

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়— আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে— ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননির পুতুলটি! ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল? আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর— আজ তো এত লোক জুটেছে, অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না— সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধ্বজায় কী দেখলি?

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা— একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না?

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়?

ঠাকুরদা। সে যে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না প'রে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে, তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!— ঐ-যে আমার পাগ্‌লা আসছে। আয় ভাই, আয়— আর তো বাজে বকতে পারি নে— একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান

তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপলচরণ
সোনার হরিণ চাই।
সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তারে বাঁধা—
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে,
লাগায় চোখে ধাঁদা।
তবু ছুটব পিছে মিছেমিছে
পাই বা নাহি পাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই।
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে—

যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে ?
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে, আছি সুখে হাস্যমুখে,
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই।

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা। ওরে, দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।

গান

আজি কমলমুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল—
মানসসরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জনছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিলভুবনমন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল!

[প্রস্থান

অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম! রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

কোশল। আমাদের জন্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

কোশল। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

অবন্তী। ওহে, তা হতে পারে, কিন্তু এখানকার মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই তো এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্তে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

কাঞ্চী। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

অবন্তী। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

কাঞ্চী। এ কী ব্যাপার! নিশেন উড়িয়ে এ দিকে কে আসে! এ কোথাকার রাজা?

পদাতিকগণের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[প্রস্থান

কোশল। একি কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

অবন্তী। তাই তো। তা হলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে— অন্ত দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন! এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে, কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাঞ্চী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই, কিন্তু তোমরা আমার অনুগত এইজন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

কাঞ্চী। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

কাঞ্চী। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাঞ্চী। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও। এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

কাঞ্চী। অসংকোচেই জানাব— তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

কাঞ্চী। এসো তবে— মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

রাজবেশী। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতি-মাত্রায় পড়েছে, সেইজন্যই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি!

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল— লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাই নে, রানী সুদর্শনাকে দেখতে চাই— সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চলতে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করো গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান

ঠাকুরদা ও কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা, আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম— কিন্তু ঠকলুম না তো?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তা হলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তা হলে ঠকলি বৈকি।

কুম্ভ। ঠাকুরদা, উৎসব শুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ঐ আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল।

ঠাকুরদা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায়

খুঁজলে মিলবে কেন ?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোশল এদের নিয়েই আছ ? দেশ-বিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে না ?

ঠাকুরদা। ভাই, এরা সব সরল লোক—চুপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে এদের' যেন কত সেবা করলুম। আর, যারা মস্তলোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা!

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে। তবে আর-কি, এইবারে শুরু করা যাক।

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে-বাইরে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যারা সোনার চোরাবালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে

তাদের   সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

যখন   থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন   শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

যখন   দ্বারে আসে মরণ-বুড়ি
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন   তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

এ যে   বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে,   অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

সে যে   উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে,
ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে
দুই   রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

[প্রস্থান

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা!

ঠাকুরদা। কী ভাই!

প্রথমা। আজ বসন্তপূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে মালা বদল করব এই পণ

করে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি।

দ্বিতীয়া। কেন বলো তো।

ঠাকুরদা। তোমাদের ঠাকরুনদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ, দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ!

দ্বিতীয়া। হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হল।

ঠাকুরদা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কী করে।

প্রথমা। তবে তাই বল, আমাদের ফাঁদের গুণ!

ঠাকুরদা। চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয়।

তৃতীয়া। আচ্ছা ঠাকরুনদিদির হিসেবটা কী রকম। আজ উৎসবের দিনে নাহয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্যে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব শেষে আমি।

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এসো এসো।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি, জানি এইখান দিয়েই

সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পা-দুটো ছট্‌ফট্‌ করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

[নাচের দলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ কথা দুশো বার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দু-শো বার? এত কঠিন সংযমের দরকার কী— পাঁচ-শো বার বল্‌-না।

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে?

ঠাকুরদা। নিজেও ভুলেছি ভাই!

তৃতীয়। আমরা চারি দিকে প্রচার করে বেড়াব আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলো। তোমাদের রাজা তো কারো কানে ধরে বলছেন না 'আমি আছি'। তিনি তো বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি 'রাজা নেই'— যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে করুক-না।

ঠাকুরদা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে?

ঠাকুরদা। ওরে, তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে— আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে! ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব? এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই! তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর্! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কী রকম দেখো-না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্-না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি, আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে! তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয় ? তা যা ভাই, আনন্দ করে বলে বেড়া গে রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব— সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে !
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন-কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

৪

প্রাসাদশিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি ?

রোহিণী। শুনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে। সেইজন্যে যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি— এই বুঝি হবে রাজা। আবার দুদিন পরে ভুল ভাঙে।

সুদর্শনা। ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না। আমি হলুম রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন ?

সুদর্শনা। ঐ মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো ?

রোহিণী। এসেছি বৈকি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে— রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা ?

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস ?

রোহিণী। হাঁ, ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প, তাই ভয় হয় কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা। আহা, যদি সুরঙ্গমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। সুরঙ্গমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!

সুদর্শনা। তা যা বলিস, সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ কথা আমি কক্‌খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম, তা হলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

সুদর্শনা। না না, সে তো বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরো বেশি। কত ছলই যে জানে। ঐজন্যেই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হোক, সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না, আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রঙ্গ দেখে হেসে বাঁচি নে।

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম, তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী। যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহভঞ্জন হোক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে'ই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না— তবু কথাটা সকলেরই মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে— ঐ দেখো-না, তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর্। পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন কে দিলে?

সুদর্শনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না— তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব না— ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে— এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারি দিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো, বসন্ত, যে-সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না— ওরে প্রতিহারী!

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী!

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে— ডাক্ ডাক্, ওদের ডেকে নিয়ে আয়— একটু গান শুনি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) ভগবান্ চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ। তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে— কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই— আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি। ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারি দিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে, অথচ আমার কণ্ঠে স্বর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান

বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা
অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে।
সুদূরের সুগন্ধধারা
বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা
ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে।

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে। আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই— তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো— ইচ্ছে করছে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই— হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো। আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা— এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে— তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মতো কিছুই আমার কাছে নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা। ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী! তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনতে আমার লজ্জা করছে। এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি— যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। তবু বল্, কী হল বল্।

রোহিণী। আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম, কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হল না।

সুদর্শনা। বলিস কী! তিনি বুঝতে পারলেন না?

রোহিণী। না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে পুতুলটির মতো বসে রইলেন। কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি! আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেমনি শাস্তি হয়েছে। তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আনলি নে কেন?

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে? পাশে ছিলেন কাঞ্চীর রাজা, তিনি খুব চতুর— চকিতে সমস্ত বুঝতে পারলেন— মুচকে হেসে বললেন, 'মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্তসখার পূজার পুষ্পে মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন।' শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, 'আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হল।' আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিলুম এমন সময়ে কাঞ্চীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।'

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হল! আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে। তা হোক, যা তুই যা, আমি একটু একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে, তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না— পরাভব, সর্বত্রই পরাভব— বিমুখ হয়ে থাকব সে শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে ঐ মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে! রোহিণী!

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী?

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য?

রোহিণী। তোমার কাছে না হোক, যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না না, ওকে দেওয়া বলে না, ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্ধা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে, ওটা খুলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম— এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল— পারলুম না। এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে, তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসবদেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম— এই অগৌরবের মালা!

৫

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা! এই দেখো-না, একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী! রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে নাকি?

দ্বিতীয়। ওরে বাস রে! কাছে ঘেঁষে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রঙ ধরাতে পারলি নে? জোর করে·ঢুকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসন-দণ্ড— ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস বুঝি?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না।

ঠাকুরদা। এখনো ডাক পড়ল না— দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শম্ভু-সুধন'রা সব গেল কোথায়?

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল, শুতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সঙ্গে অমন খাড়া জাগতে পারে।

[প্রস্থান

বাউলের দল

যা ছিল কালো ধলো

তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।

যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ

তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাঙা হল বসন ভূষণ

রাঙা হল শয়ন স্বপন,

মন হ'ল কেমন দেখ্ রে— যেমন

রাঙা কমল টলমল।

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ— খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল! কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে— সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি-চুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা

প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।

বড়ো উতলা আজ পরান আমার

খেলাতে হার মানবে কি ও?

কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে

রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?

তুমি সাধ করে, নাথ, ধরা দিয়ে

আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—

এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু

রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

[প্রস্থান

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা। ওমা! ওমা! যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো।

দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথমা। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই ?

ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্যে।

তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি ?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি

সর্বনাশের আশায়।

আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি

পথে যে-জন ভাসায়।

দ্বিতীয়া। আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে

দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী!

ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে ধরা দেওয়াও যা, ছাড়া পাওয়াও তা।

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল, কিন্তু মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না— তোরা তো বাড়ি চলেছিস, তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন।
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন।
তোমার তালে আমার চরণ চলে,
শুনতে না পাই কে কী বলে—
তাধিন তাধিন।
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে—
তাধিন তাধিন।

আমার   লাজের বাঁধন, সাজের বাঁধন,

খসে গেল ভজন সাধন—

তাধিন তাধিন।

বিষম   নাচের বেগে দোলা লেগে

ভাবনা যত সব ভেগেছে—

তাধিন তাধিন।

[নাচের দলের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা ?

ঠাকুরদা। দ্বারের কাজে ছিলুম।

সুরঙ্গমা। সে কাজ তো শেষ হল। একটি মানুষও নেই— সবাই চলে গেছে।

ঠাকুরদা। এবার তবে ভিতরে চলি।

সুরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

সুরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর বাঁশি কারো বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না, তা না হলে লজ্জায় আর-সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা! এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই!

সুরঙ্গমা। তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে? রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে, আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।

গান

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে!
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু
সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥
কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী-সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে ভবনে—
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেইরকম কোরো। ভুল না হয়।

রাজবেশী। ভুল হবে না।

কাঞ্চী। করভোস্তানের মধ্যেই রানীর প্রাসাদ ?

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কাঞ্চী। সেই উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেবে— তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

রাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ডরাজ আমার, কেবলই মনে হচ্ছে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলছি, এ দেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে, সত্য হোক-মিথ্যে হোক, একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে এই হিতকার্যটা নিজেই করব। (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে, কে তুমি ? কোথায় লুকিয়ে ছিলে ?

ঠাকুরদা। লুকিয়ে থাকি নি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি।

রাজবেশী। ইনি এ দেশের রাজাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, নির্বোধেরা বিশ্বাস করে।

ঠাকুরদা। বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ ?

ঠাকুরদা। আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে।

ঠাকুরদা। আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল ?

কাঞ্চী। বিড়্ বিড়্ করে বকছ কী ?

ঠাকুরদা। আমি বলছি দেশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই বুঝি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল নাকি ?

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো— বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে সে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোদ্যান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী! কিছু তো বুঝতে পারছি নে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস ?

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস ?

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোন্ রাজা ?

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি ?

প্রথম মালী। হাঁ সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব।

[প্রস্থান

রোহিণী। এরা কী বলে বুঝতে পারি নে— ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন, কিন্তু কোথায় কিছুই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি।

[প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে! শীঘ্র একটা দুর্দৈব ঘটবে। আমাকে সুদ্ধ জড়াবে না তো?

অবন্তীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান?

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়?

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। সখী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান?

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল?

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তারা বললে রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন্ রাজা?

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

অবন্তী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হোক এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

[দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাঁধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিষ্কৃতি নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম তখন তিনি তো এক রকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন— তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই পুরস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরো বাড়ছে। এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন? এখন তো এদের ওড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ওদিকে দৌড়ল কোথায়? চপলা! চপলা! আমার ডাক শুনলই না। এমন তো কখনোই হয় না। চার দিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মতো হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে! যেন চার দিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্মত্ততা আজ! ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই!

৭

রানীর প্রাসাদদ্বার

রাজবেশী। এ কী কাণ্ড করেছ কাঞ্চীরাজ!

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চার দিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাঞ্চী। তুমি তো এ দেশের লোক— পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী! ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো! চার দিকে আগুন!

কাঞ্চী। মূঢ় ওঠ্, আর দেরি না।

সুদর্শনা। (প্রবেশ করিয়া) রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।

[কাঞ্চীরাজের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়! এ রাজা নয়! তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে—আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব—হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) রানী, ও দিকে কোথায় যাও? তোমার অন্তঃপুরের চার দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবারই আগুন।

প্রাসাদে প্রবেশ

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই— কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

রাজা। হতাশ হোয়ো না রানী!

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা— আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তো ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চার দিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে 'ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব'। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম! আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা!

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম! কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল— আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো— তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো— কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি, যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না— আমাকে বিপদ বলে মনে ক'রে আমার কাছ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে— এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে, রানী, হবে। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে, সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ-ভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
সোহাগ আমার মালা করে
গলায় তোমার পরাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

সুদর্শনা। হবে না, হবে না— শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে! আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে —সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন-সুদ্ধ ঝল্‌মল্ করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বললুম, এখন আমাকে শাস্তি দাও।

রাজা। শাস্তি শুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেখো।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না— তোমাকে আমি সইতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি

আমাকে— জানি নে আমাকে তুমি কী করেছ! কিন্তু কেন তুমি এমনতরো? কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি— তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্‌বুদের মতো শূন্য।

সুদর্শনা। তা হোক, কিন্তু আমি পারছি নে— তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে! আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্য দিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করছি— কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরো বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে দূরে চলে যাই— এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না ব'লেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দ্বিধা হয়। তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও-না কেন? তুমি আমাকে মারো না-কেন? মারো, মারো, আমাকে মারো। তুমি আমাকে কিছু বলছ না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। কিছু বলছি নে কে তোমাকে বললে।

সুদর্শনা। অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীৎকার করে বলো—

বজ্রগর্জনে বলো— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো— আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

রাজা। ছেড়ে দেব, কিন্তু যেতে দেব কেন ?

সুদর্শনা। যেতে দেবে না ? আমি যাবই।

রাজা। আচ্ছা, যাও।

সুদর্শনা। দেখো, তা হলে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে, কিন্তু রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না— আমি চললুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে— এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান

সুরঙ্গমার

প্রবেশ ও গান

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ !
কঠিন করে চরণ-'পরে
প্রণত করো মন।
বেঁধেছ মোরে নিত্যকাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে,
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।

এসো হে, ওহে আকস্মিক,
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক—
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক
নিমেষে এ জীবন।
তাহার পরে প্রকাশ হোক
উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন।

সুদর্শনা। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) রাজা! রাজা!

সুরঙ্গমা। তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শনা। চলে গেছেন? আচ্ছা বেশ, তা হলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আচ্ছা, ভালোই হল— তা হলে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা। কেনই বা বলবেন? বলবার তো কথা নয়। তা হলে আমি মুক্ত। আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম, কিন্তু মুখে বেধে গেল। বল্ দেখি, বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন?

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তা হলে ওদের কী হল?

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার

করে দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সুদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করেছিস? রাজার কাছ থেকে এ পর্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব— এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না।

সুরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি।

সুদর্শনা। তবে তুই কী চাস?

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কী বলিস তুই? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা!

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন।

সুদর্শনা। পাগলের মতো বকিস নে। আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম, সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস?

সুরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব— সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

সুদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না— তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে— সে আমি সইতে পারব না।

সুরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি— আমাকে পর করে রাখতে পারবে না— আমি যাবই।—

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী,
আমি সকল দাগে হব দাগি।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন—
যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।

৯

সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

কান্যকুব্জ। সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই ?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে ? অন্ধকার হোক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তার বাসের ব্যবস্থা করে দিই ?

কান্যকুব্জ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে— এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

কান্যকুব্জ। যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তা হলে পিতা নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুব্জ। সে যে আমার কন্যা এ কথা যেন প্রকাশ না হয়— তা হলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে।

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ ?

কান্যকুব্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি— সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে— আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে— তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস, ওতে আমার আরো রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা?

সুদর্শনা। সে আমি জানি নে— কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে সমস্ত ছারখার হয়ে যাক। অতবড়ো রানীর পদ এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে? মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া? সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না?

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁয়ায়— এখনো সময় যায় নি।

সুদর্শনা। রানীর মহিমা ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এলুম, এখানে আর কেউ নেই যে আমার সঙ্গে মিলবে। একলা— একলা আমি। আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্যে কেউ এক পা'ও বাড়াবে না?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না— একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারি নি— ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস

জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা। আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি না কেন?

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগুন লাগায় নি— আগুন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

সুদর্শনা। ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ— তার ভিতরে মানুষ নেই! এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা! কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনো ফেরাবার জন্যে আসে? (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! কখনো না! রাজা এলেও আমি ফিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না! চলে যাবার দ্বার একেবারে খোলা রইল। বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রানী বলে আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষুকও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি! চুপ করে রইলি যে? বল্-না তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে— আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এই রকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে— আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ্ তো, ঐ মাঠের পারে পূর্বদিগন্তে যেন ধুলো উড়ছে।

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই তো দেখছি।

সুদর্শনা। ঐ-যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাচ্ছে না?

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে! তবে তো এল!

সুরঙ্গমা। কে আসছে?

সুদর্শনা। আবার কে? তোর রাজা। থাকতে পারবে কেন? এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য।

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। না বৈকি। তুমি তো সব জান। ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছুতেই টলেন না! দেখি কেমন না টলেন। আমি জানতুম সে ছুটে আসবে। কিন্তু মনে রাখিস, সুরঙ্গমা, আমি তাকে একদিনের জন্যেও ডাকি নি। আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সুরঙ্গমা, যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই বুঝি যাব? কখনো না। আমি যাব না। যাব না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। নয়! তুই সত্যি বলছিস! এখনো আমাকে নিতে এল না!

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

সুদর্শনা। এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেই আসছে।

সুদর্শনা। তার নাম কী জানিস?

সুরঙ্গমা। তার নাম সুবর্ণ।

সুদর্শনা। তবে তো সে আসছে। ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। সুবর্ণকে তুই জানতিস ?

সুরঙ্গমা। যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

সুদর্শনা। না না, তোর মুখে আমি তার কোনো কথা শুনতে চাই নে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা। তার পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল্ তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস ?

সুরঙ্গমার গান

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি ?
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী ॥

১১

শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুব্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে আসি নি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যেই অপেক্ষা।

দূত। মহারাজ স্মরণ রাখবেন রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তার আশ্রয়।

দূত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দূত। জীবন থাকতে সে সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না—মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না, কারণ তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন্!

সুবর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাকবে!

সুবর্ণ। এমন কাপুরুষ আমি না।

দূত। এ যদি আপনাদের পরিহাসবাক্য না হয় তা হলে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের।

কাঞ্চী। রাজন্!

সুবর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

সুবর্ণ। এও কি কখনো হয়?

দূত। তবে কী ইচ্ছা করেন।

কাঞ্চী। সেও কি বলতে হবে?

সুবর্ণ। তা তো বটেই। সে তো বুঝতেই পারছেন।

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব, এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি এই কথা রাজাকে জানাও গে।

[দূতের প্রস্থান

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে— কিন্তু—

কাঞ্চী। কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি, মহারাজ, ঐ কিন্তুটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ঐ কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম— কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্যে আসছেন সংবাদ পেলুম।

[প্রস্থান

কাঞ্চী। যা ভয় করছিলুম তাই হল। সুদর্শনার পলায়ন-সংবাদ রটে গিয়েছে— এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বলছি আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাঞ্চী। কেন? তাতে তাঁর লাভ কী।

সুবর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে মরবে— মাঝের থেকে যাঁর ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাঞ্চী। এখন বেশ বুঝছি কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে সর্বত্রই দেখা যাবে এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনো আমি বলছি তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে— তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভ -রাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ওপারে।

[প্রস্থান

কাঞ্চী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক তার পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ঐ উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি— আমি অতি হীনব্যক্তি— আমার দ্বারা—

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সিঁড়ি বল, রাস্তা বল, পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয় তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে, কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি, মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থটাই বুঝে নেন।

কাঞ্চী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্ত্রী না করে গোয়ালঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে— সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তা হলে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যুদ্ধ এখনো চলছে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ, এখনো চলছে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি— ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ করে দিই। সত্যিই যদি তাই করতেন ভালো হত। সুরঙ্গমা !

সুরঙ্গমা। কী মা !

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারো বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তা হলে সকলকেই নির্বাক্ হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছুই বুঝি নে জানি, সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ তো।

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

সুদর্শনা। আর কেউ না ?

সুরঙ্গমা। সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল— কাঞ্চীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন।

সুদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আসতে তা হলে তোমার যশ বাড়ত

বৈ কমত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন ?

সুরঙ্গমা। সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা, ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্তেই ভয়, নইলে একলার জন্তে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। দেখ্ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

সুরঙ্গমা। তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে।

সুরঙ্গমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আর বাজায়।

সুদর্শনা। তা হবে! কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর-ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তানের পর তান, ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। আহা মা, সে কী অন্ধকার! সেই অন্ধকারের দাসী আমি।

সুদর্শনা। আমার জন্তে সেখান থেকে তুই কেন এলি ?

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্তে।

সুদর্শনা। না না, তিনি আসবেন না— তিনি আমাদের একেবারে

ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন! অপরাধ তো কম করি নি।

সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তা হলে তাঁকে আর দরকার নেই। তা হলে তিনি নেই। তা হলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য— তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি— কেউ ডাকে নি— সমস্ত বঞ্চনা।

দ্বারীর প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি ?

দ্বারী। আমি এই প্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। কী খবর শীঘ্র বলো।

দ্বারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। বন্দী হয়েছেন ? মা গো বসুন্ধরা!

মূর্ছা

১৩

বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল ?

কলিঙ্গ। কই শেষ হল ? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না ?

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্তমাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধুলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু, মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবি মেটাবেন কী করে।

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবি তো রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কী পরিষ্কার করেই বলো।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ম্বরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন— আমাকে জীবিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক দুঃখ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে প্রস্তাব করলেন তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ম্বরের দিন স্থির হোক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাঞ্চী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ!

সুবর্ণ। কী আদেশ?

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

সুবর্ণ। কিংকর প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম। রানী সুদর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনো তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ করে নি দেখছি। যাই হোক, তিনি তো রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না, অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না। অতএব যেমন করেই হোক এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই যে-সব অমূলক কল্পনা করছেন

এ অতি ভয়ানক কল্পনা— দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না— আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তা হলে স্বয়ম্বরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা। তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক্, ধিক্ আমাকে!

সুরঙ্গমা। সেইসঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বললে, 'তোমার রানীকে বোলো বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।'

সুদর্শনা। চুপ কর্! চুপ কর্! আমাকে আর দগ্ধ করিস নে।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ঐ যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই কেবল মুকুটে একটি ফুলের মালা জড়ানো উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ঐ সুবর্ণ! তুই সত্যি বলছিস!

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বলছি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না! সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর-একটা কী দেখেছিলুম। ও নয়, ও নয়!

সুরঙ্গমা। সকলে তো বলে ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।

সুদর্শনা। ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে!

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন?

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) স্বয়ম্বরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরখানা নিয়ে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না! (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি, বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু! সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর—তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে—

সে তুমিই, সে তুমি !—

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,

ওহে অন্ধকারের স্বামী !

এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে

আমার চিত্তে এসো নামি।

এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা

ওহে অন্ধকারের স্বামী !

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা

ওই চরণে যাক থামি।

নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে

ওহে অন্ধকারের স্বামী !

সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,

ওহে আমি বাঁধনকামী।

আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,

ওহে অন্ধকারের স্বামী !

সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে চরম—

ওগো মরুক-না এই আমি॥

১৫

স্বয়ম্বরসভা

রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি।

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই বলে। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লজ্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহুশোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণ বর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাঞ্চাল। সেটা কি উনি ভালো করছেন? সকলেই জানে রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো— আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে?

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই ফল মধুর হয়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ বয়সে বারম্বার আশাকে ত্যাগ

করলেও সে প্রগল্‌ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে— আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ না'ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে ?

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম, দৈবজ্ঞ বলেছিল যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বৈ ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ কোশলরাজ ! ফল ত্যাগ করাবার জন্যে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল।

কোশল। ছিল বৈকি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প নাকি ?

কাঞ্চী। ভূমিকম্প ? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হতে পারে, কিন্তু তা হলে তো দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ !

বিদর্ভ। অদৃষ্টপুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্যে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ো না।

কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকবে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যেন একটা—

কাঞ্চী। ঐ যেন-একটার কথা তুলবেন না— ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।

কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি ?

পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্ছে।

কাঞ্চী। তবে আর কি— নিশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন— এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ, অমনতরো সংকুচিত হয়ে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপছে যে।

যোদ্ধ্‌বেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙ্গ। ও কী ও ? ও কে ?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে ?

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়। কলিঙ্গরাজ তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক-না কী বলে।

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা ?

পাঞ্চাল। কোন্‌ রাজা ?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা ?

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা ?

কলিঙ্গ। কে ?

কোশল। কে সে ?

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন ?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায় ?

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস্! আহ্বান! কীভাবে আহ্বান করেছেন ?

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই— সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে ?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি ? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি ? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি— তুমি আবার সেনাপতি !

ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে! তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন— বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব— কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ, আমরা আপনারই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো তোমার রাজছত্র ধুলায় লুটোচ্ছে; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি, রাজদূত— কিন্তু সভায় নয়, রণ-ক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে'ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাল্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্ছি— শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে, এখন ভীরুতা করে সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করছে?

১৬

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন ?

সুরঙ্গমা। তা তো বলতে পারি নে—পথ চেয়ে বসে আছি।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে বেদনা বোধ হচ্ছে। লজ্জাতেও মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাব কেমন করে !

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও, তা হলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে—কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কিনা, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বলত আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই—সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রানীমা ! কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া। সুরঙ্গমা, সেই আশীর্বাদ কর্‌ যেন—

সুরঙ্গমা। কী বল তুমি! আমি আশীর্বাদ করব কিসের!

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে নুইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে—সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু, কই, রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী—কর কী রানী! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন।

ঠাকুরদা। ঐ তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী! যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন!

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে, সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন! ওরে, ওরে কী কঠিন! কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি— বুক ফেটে গেল— কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে!

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে— সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি— এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি— নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন! ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। এই জানলার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব— এক পা নড়ব না— দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প— জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার— কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে! কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে

দেখাতেন কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখালেন আর কই ?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না ? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল ?

১৭

নাগরিকদল

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে— কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না? ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল— কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়— কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে!

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি— ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল লড়াই করে মরব আমি আর তার ফল ভোগ করবে আর-কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল, কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে

হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এ জন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি— সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল ?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে, কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ঐ কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তার লেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তা হলে কাঞ্চীকে কি আর আস্ত রাখতুম। ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই, মস্ত মস্ত বিচারকর্তা— ওদের বুদ্ধি এক রকমের।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি! ওদের সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে!

১৮

পথ

ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ, তুমি পথে যে!

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ঐ তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি—তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক, সে যত বড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে?

কাঞ্চী। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো?

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি— আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর-কি। এখন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে?

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানা ক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল— রণক্ষেত্রেও মন্দ জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর্ তো রে ভাই, তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর্।

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুন্ঠিত কুন্ঠিত জীবনে,
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই　　সংগীতমুখরিত গগনে
তব　　গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই　　বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো　　ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।
অতি　　নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি　　পল্লবে পল্লবে বাজে রে।
দূরে　　গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি　　ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর　　পরানে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে　　দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে—
এই　　সৌরভবিহ্বলা রজনী
কার　　চরণে ধরণীতলে জাগিছে!
ওগো　　সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব　　গম্ভীর আহ্বান কারে!

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে— আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি— দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হূহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে— সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা, কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে— তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির স্থর বাজে! বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল— কিন্তু গোপন রাত্রের সেই স্থরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো স্থর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল— পথে বের করলে তবে ছাড়লে।

মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি— কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল— আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে— অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে— এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে— এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা— এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন— আমার হাত ধরেছেন— সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন— হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত— এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই? সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু-চরণপাতে?
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে ॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ, সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না মা!

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) মা, তুমিও চলেছ বুঝি? আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ— আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল— আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কাঞ্চী। কিন্তু, মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না— যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ

থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি— আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। রানীমা, ঐ দেখো, পূর্ব দিকে চেয়ে দেখো, ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা— তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে
উঠে আলোকেরই গান।
ধন্য হলি ওরে পান্থ, রজনী জাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি
ধুলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে সমীরণ জাগিয়াছে।
মধুভিক্ষু সারে সারে আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা, মোছ মোছ অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি
ঘুচিল রে অভিমান॥

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি, ঠাকুরদা, পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই!

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হোক। আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক, আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না! সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন— সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বেঁচেছি বেঁচেছি— আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক— তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক— ফুলের রেণু এখন থাক্, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে

মনে করছ ? যে পায় তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে— সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে, যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই! যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে— এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে।— আর এই আমাদের রানীকে দেখো— ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল— মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে— কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে— সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই— তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে— আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করছে।

সুরঙ্গমা। ঐ-যে সূর্য উঠল!

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব, রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখে-ছিলুম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে— তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও— সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম— এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

—

গ্রন্থপরিচয়

রাজা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১৩১৭ সালের পৌষ মাসে রাজা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'লেখকের নিবেদন' হইতে জানি "এই 'রাজা' প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া [প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়ত তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।" এই সংস্করণই তদবধি প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই বা প্রকাশিত হয় নাই— শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। অরূপরতন (মাঘ ১৩২৬) "নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত[১] তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল[২]।"

"আমার ধর্ম"[৩] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনা করিয়াছেন—

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তার পরে সেই

১ দ্রষ্টব্য, Rajendralala Mitra, "Story of Kus'a", *The Sanskrit Buddhist Story of Nepal*, pp. 142-45.

২ পৌষ ১৩৩৮। পুনশ্চ গ্রন্থে সংকলিত।

৩ আত্মপরিচয় গ্রন্থে তৃতীয় প্রবন্ধে সংকলিত।

ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।"

অরূপরতনের ভূমিকায় (মাঘ ১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল— অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল— সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া

পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে— আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

রাজা নাটকের অনুবাদ *The King of the Dark Chamber* (1914) পুস্তকের কোনো সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সি. এফ. এণ্ড্রুজ মহাশয়কে এক পত্রে[৪] লেখেন—

CALCUTTA, *November 15th*, 1914

Critics and detectives are naturally suspicious. They scent allegories and bombs where there are no such abominations. It is difficult to convince them of our innocence.

With regard to the criticism of my play, *The King of the Dark Chamber*, that you mention in your letter, the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature. However it does not matter what things are, according to the rule of the critics. They are what they are, and therefore difficult of classification... .

৪ রবীন্দ্রনাথের *Letters to a Friend* গ্রন্থে সংকলিত।

মূল্য ১৬.০০ টাকা

রাজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা

রাজা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

রাজা

১

অন্ধকার ঘর

রানী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো. আলো কই? এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না!

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে-ঘরেই তো আলো জ্বলছে— তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না?

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে?

সুরঙ্গমা। তা হলে যে আলোও চিনবে না, অন্ধকারও চিনবে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থ ই বোঝা যায় না। বল্ তো এ ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি কোথা দিয়ে বেরোই প্রতিদিনই ধাঁদা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল, যে, এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন?

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা— এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই— আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কী, মা, যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব!

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত— মদ খেত আর জুয়ো খেলত।

সুদর্শনা। তুই কী করতিস?

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল— ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল?

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম— সে পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মতো কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত?

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদর্শনা। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর, এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না— সবাই যেন কী-একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী! সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রানীমা! সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ঐ এক-রকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অল্প বয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্রিকে আমার সুখদুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্‌খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বলব— সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত, এমন আশ্চর্য। যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই— আর মনে হয় এই আমার ঢের— আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝতে পারি নে, তবু শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস তাঁকে দেখবই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামীরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি আমার স্বামীকে দেখতে কেমন। তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না; বলেন, 'আমি কি দেখেছি— আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি।' যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

সুরঙ্গমা। ঐ-যে মা, একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া?

সুরঙ্গমা। ঐ-যে গন্ধ পাচ্ছ না!

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খুলেছে— তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা, তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে— আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তা হলে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা, হবে। তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ, সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন 'সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো এই তোমার কাজ', তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম— আমি মনে মনেও বলি নি 'যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও'। তাই যে কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না। ঐ-যে তিনি আসছেন, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু!

বাহিরে গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও,
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা—

আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে।
এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।
ভরি লয়ে বারি এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে ?
বেঁধেছ কি চুল ? তুলেছ কি ফুল ?
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে ?
ধেনু এল গোঠে ফিরে,
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।
তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে।

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা ? ও তো বন্ধ নেই, কেবল ভেজানো আছে— একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না ? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুকবে না ?

গান

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ ?
নিশ্বাসবায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন।

যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধুলার ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি   দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ!
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে   এসো বলভরে
এসো এসো গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু ব'লে—
ছুটে এসে দ্বারে   করি আপনারে
চরণে সমর্পণ।

রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না।

সুদর্শনা। আমি এ ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাই নে— কোথায় দরজা কে জানে। তুই এখানকার সব জানিস— তুই আমার হয়ে খুলে দে।

সুরঙ্গমার দ্বার উদ্‌ঘাটন

[প্রণাম ও প্রস্থান

[রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না]

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে

আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না?

রাজা। কে বললে দেখতে পায়। মূঢ় যারা তারা মনে করে 'দেখতে পাচ্ছি'।

সুদর্শনা। তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না— কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না— তুমি বল কী! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ঐ সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়— আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না এ কী কথা।

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না?

সুদর্শনা। এক-রকম করে আসে বৈকি। নইলে বাঁচব কী করে?

রাজা। কী রকম দেখেছ?

সুদর্শনা। সে তো এক-রকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই-রকম— এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে

যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেতচন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে— তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু। তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহ-দ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর-মহলে প্রবেশ করব। আর, যদি না পারি, তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্‌-এক অনেক-দূরের জন্তে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে ; কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্তে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে ঘুরে মরবে। আর, বসন্তকালে এই-যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই, অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

রাজা। সে ভয়ে দোষ কী? প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি— এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও ?

রাজা। পাই বৈকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও ? আচ্ছা, কী দেখ ?

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার !

সুদর্শনা। আমার এত রূপ ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না ; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না— ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কত বড়ো ! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি !

সুদর্শনা। বলো বলো, এমনি করে বলো। আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে— যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ ? না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর ? তোমার গানে সেই অলোকসুন্দরীকে দেখতে পাই— সে কি আমার মধ্যে, না, তোমার মধ্যে ? তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও-না ! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই ? সেইজন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই-যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার— যা আমার উপর ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে

তার কিছুই নেই! তবে এ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা দেখো, কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে। কেউ তোমাকে বলে দেবে না— আর, বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী?

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব— লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো— চেয়ে দেখো— আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। কী প্রভু?

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন, কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু!

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে,

জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে— সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জ-বনে।

সুরঙ্গমা। সে লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল— চোখে ধাঁদা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে— তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে! তুমি আমার তেমন রাজা নও। রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
আজি হৃদয়মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা, আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিনবায়।
আজি ফুলের বাসে, সুখের হাসে, আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগলপ্রায়—
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

২

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

তৃতীয়। ঐ-যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌছবে। সামনে চলে যাও।

[প্রস্থান

প্রথম। শোনো একবার, কথা শোনো! বলে সবই এক রাস্তা! তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

দ্বিতীয়। তা, ভাই, রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়— বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁদা। আমাদের রাজা বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো— রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ দেশে উল্টো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না— তবু মানুষও তো ঢের দেখছি। এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

প্রথম। ওহে জনার্দন, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ।

জনার্দন। কী দোষ দেখলে?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই

বুঝি ভালো হল ? বলো তো ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো !

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনার্দনের ঐ একরকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন— রাজার কানে যদি যায় তা হলে ম'লে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো, ভাই, এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই— দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই— রাম রাম !

কৌণ্ডিল্য। সেও তো ঐ জনার্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান— কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল— শাস্ত্রমতে ঠিক ঊনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে— একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ঐ ঊনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়। সে এক বিষম মুশকিল। শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, ঊনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় ঊনপঞ্চাশকে উল্‌টে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও— তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি ! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ !

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা !

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দন বলে কিনা খোলা রাস্তাই ভালো !

[সকলের প্রস্থান

বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে, দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে— হার মানলে চলবে না— আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুলবিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়ালফুলের রেণু
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে!
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে!
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,

তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।

[সকলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি, একদিনও তাকে দেখলুম না, এ কি কম দুঃখের কথা!

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি, কবে কার কথা কাকে বলেছি। ঐ-যে তোমাদের রাহক দাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি? সব তো জান।

দ্বিতীয়। জানি বৈকি, সেইজন্যেই তো বলছি— কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি, নইলে বিপদ ঘটতে পারে।

তৃতীয়। তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ! বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন? কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সামলে বেড়ায়?

বিরূপাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্যেই— তা বেশ, নাই বললেম। আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই। রাজা দেখা দেন না,

সে কথাটা তোমরাই তুললে— তাই তো আমি বললেম, সাধে দেখা দেন না!

প্রথম। ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেলো-না।

বিরূপাক্ষ। তা, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই— তোমরা হলে বন্ধু-মানুষ— (মৃদুস্বরে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই তো বটে। আমরা বলি, ভালো রে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন! কিছু না হোক, একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে 'বেটার শির লেও' তা হলেও যে বুঝি রাজা বলে একটা কিছু আছে। বিরূপাক্ষের কথাটা মনে নিচ্ছে হে।

তৃতীয়। কিচ্ছু মনে নিচ্ছে না— ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে।

বিরূপাক্ষ। কী বললে হে, বিশু, তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি?

বিশ্ববসু। তা বলতে চাই নে, কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না— এতে রাগই কর আর যাই কর।

বিরূপাক্ষ। তুমি মানবে কেন! তুমি তোমার বাপ-খুড়োকেই মান না— এত বুদ্ধি তোমার। এ রাজত্বে রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তা হলে কি এখানে তোমার ঠাঁই হত। তুমি তো নাস্তিক বললেই হয়।

বিশ্ববসু। ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে!

বিরূপাক্ষ। দেখো বিশু, মুখ সামলে কথা কও।

বিশ্ববন্ধু। মুখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই।

প্রথম। চুপ চুপ, এ-সব ভালো হচ্ছে না। আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি। আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে? মালাটি কোন্ নিপুণ হাতের গাঁথা?

ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি? কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে?

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকরুনদিদি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখে বটে! পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন?

ঠাকুরদা। ওরে, তোদের ঠাকরুনদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা, কবি কী বলছেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বলছেন—

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে—
ঠাকুরদাদা!

যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে—
ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। আরে চুপ চুপ! এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে!

প্রথম। কেন ধরলুম জান না?—

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে।
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদাদা!

ঠাকুরদা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তা হলে শুনতে পেতিস এই ফাল্গুন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি পুরোনো জিনিসমাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগ-রাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে!

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন? চলো আমাদের দক্ষিণ বনে।

ঠাকুরদা। ভাই, আমার ঐ দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশ-বিদেশের লোক এসেছে; সবাই বলছে, 'সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন?' কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ঐটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে— তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে। এই-যে অন্য রাজাগুলো তারা তো উৎসবটাকে দ'লে ম'লে ছারখার করে দিলে— তাদের হাতি-ঘোড়া লোক-লশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস—

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,

আমরা   নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে !
(আমরা সবাই রাজা)

রাজা   সবারে দেন মান,
সে মান   আপনি ফিরে পান,
মোদের   খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে !
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা   চলব আপন মতে
শেষে   মিলব তাঁরি পথে
মোরা   মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে !
(আমরা সবাই রাজা)

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল, তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখো-না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে, কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে— প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন।

বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববসু। এই-যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না !

ঠাকুরদা। এতে রাগ কর কেন বিশু। ওর রাজা কুৎসিত বৈকি, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন! স্বয়ং ওর বাপ-মা'ও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বিরূপাক্ষ। ঠাকুরদা, আমি নাম করব না, কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি যাকে বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই।

ঠাকুরদা। নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো।

বিরূপাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে! একে তো যা না বলবার তাই বলে. তার পরে আবার সেটা প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও-না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও-না।

ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ কোরো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও বেচারা আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিরূপাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে।

[সকলের প্রস্থান

বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখো ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা— নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না!

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তা হলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

জনার্দন। এই দেখো-না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না— কিন্তু রাজা কোথায়. তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন— কিন্তু এখানে দেখো—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও-না হে— হাঁ কি না। রাজাকে দেখেছ কি দেখ নি।

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা-চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা-অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের

মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে।

[সকলের প্রস্থান

বাউলের দল

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো, তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যে দিক -পানে।
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা—
শোনা হল না, শোনা হল না—
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই-যে শুনি
শুনি তাহার বাণী আপন গানে।
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না, মেলে না—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে, দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে।

[প্রস্থান

একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

প্রথম পথিক। ইস, তাই তো! মস্তলোক বটে! লম্বা পা ফেলে চলছেন! কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর নাকি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

দ্বিতীয় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

দ্বিতীয় পথিক। সত্যি নাকি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ঐ দেখো-না নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পথিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে!

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে দেখছ না?

দ্বিতীয় পথিক। ওরে, কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি— একেবারে লাল টকটক্ করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

দ্বিতীয় পথিক। না, দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

দ্বিতীয় পথিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর— অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর-গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই-যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে শহর ঘুরে বেড়ালো— আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায়, সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেইরকম মেকি রাজা বলতে চাও!

প্রথম পদাতিক। ওহে খুড়শ্বশুর, এবার খুড়শাশুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি কান মলছি, নাকে খত দিচ্ছি— যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে— আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

দ্বিতীয় পথিক। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি, অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি— আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা— যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই, এক ধার থেকে গড় করে যাই— সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী ?

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না— দামী জিনিস— বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ঐ-যে আসছেন রাজা। আহা, রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা! যেন ননির পুতুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে ?

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো— কী জানি ভাই, হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁদা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি।

[প্রস্থান

আর-একদল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে, রাজা রে, রাজা! দেখবি আয়।

দ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি। লোকের কারো কথায় কান দিই নি— আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে— তখনো কাক ডাকে নি— এতক্ষণ ছিলে কোথায়! রাজা,

আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর— এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে ?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

[প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে, পিছিয়ে থাকলে চলবে না— ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

দ্বিতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্, একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্। আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তাল-পাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে!

মাধব। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে— ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

মাধব। ওহে, রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না ? এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। না হে না, রাজারা বোঝে না কিছু— হয়তো ঐ তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে।

[সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে ?

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল— একজন না, দুজন না, রাস্তার দু ধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার

লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কি!

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়— আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে— ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা— একেবারে ননির পুতুলটি! ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল? আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর— আজ তো এত লোক জুটেছে, অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না— সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধ্বজায় কী দেখলি?

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা— একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বৈকি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না?

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়?

ঠাকুরদা। সে যে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না প'রে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে, তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!— ঐ-যে আমার পাগ্‌লা আসছে। আয় ভাই, আয়— আর তো বাজে বকতে পারি নে— একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান

তোরা যে যা বলিস ভাই,
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপলচরণ
সোনার হরিণ চাই।
সে যে চমকে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়,
যায় না তারে বাঁধা—
তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে,
লাগায় চোখে ধাঁদা।
তবু ছুটব পিছে মিছেমিছে
পাই বা নাহি পাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই।
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে—

যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে ?
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে—
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে, আছি সুখে হাস্যমুখে,
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপন-মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই।

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা। ওরে, দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।

গান

আজি কমলমুকুলদল খুলিল!
দুলিল রে দুলিল—
মানসসরসে রসপুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জনছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে—
নিখিলভুবনমন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল!

[প্রস্থান

অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম! রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

কোশল। আমাদের জন্তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

কোশল। এই-সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

অবন্তী। ওহে, তা হতে পারে, কিন্তু এখানকার মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই তো এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্তে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

কাঞ্চী। একটা ফন্দি দেখাই যাক-না।

অবন্তী। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

কাঞ্চী। এ কী ব্যাপার! নিশেন উড়িয়ে এ দিকে কে আসে! এ কোথাকার রাজা?

পদাতিকগণের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[প্রস্থান

কোশল। একি কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

অবন্তী। তাই তো। তা হলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে— অন্ত দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন! এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, বেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে, কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাঞ্চী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই, কিন্তু তোমরা আমার অনুগত এইজন্ত একবার দেখা দিতে এলুম।

কাঞ্চী। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

কাঞ্চী। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাঞ্চী। আছে বৈকি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্ত তোমরা দূরে যাও। এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

কাঞ্চী। অসংকোচেই জানাব— তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

কাঞ্চী। এসো তবে— মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

রাজবেশী। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেইজন্যই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি!

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তা হলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি— পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল— লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাই নে, রানী সুদর্শনাকে দেখতে চাই— সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চলতে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করো গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান

ঠাকুরদা ও কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা, আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম— কিন্তু ঠকলুম না তো ?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তা হলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তা হলে ঠকলি বৈকি।

কুম্ভ। ঠাকুরদা, উৎসব শুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ঐ আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল।

ঠাকুরদা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্ত জায়গায়

খুঁজলে মিলবে কেন?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোশল এদের নিয়েই আছ? দেশ-বিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে না?

ঠাকুরদা। ভাই, এরা সব সরল লোক—চুপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে এদের' যেন কত সেবা করলুম। আর, যারা মস্তলোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা!

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে। তবে আর-কি, এইবারে শুরু করা যাক।

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে-বাইরে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যারা সোনার চোরাবালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে

তাদের   সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যখন   থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন   শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যখন   দ্বারে আসে মরণ-বুড়ি
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন   তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
এ যে   বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে,   অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।
সে যে   উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে,
ঝরিয়ে দিয়ে, শুকিয়ে দিয়ে
দুই   রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

[প্রস্থান

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা!

ঠাকুরদা। কী ভাই!

প্রথমা। আজ বসন্তপূর্ণিমায় চাঁদের সঙ্গে মালা বদল করব এই পণ

করে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি।

দ্বিতীয়া। কেন বলো তো।

ঠাকুরদা। তোমাদের ঠাকরুনদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ, দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ!

দ্বিতীয়া। হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হল।

ঠাকুরদা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কী করে।

প্রথমা। তবে তাই বল, আমাদের ফাঁদের গুণ!

ঠাকুরদা। চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয়।

তৃতীয়া। আচ্ছা ঠাকরুনদিদির হিসেবটা কী রকম। আজ উৎসবের দিনে নাহয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্যে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব শেষে আমি।

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এসো এসো।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি, জানি এইখান দিয়েই

সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পা-দুটো ছট্‌ফট্‌ করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ!

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

[নাচের দলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ কথা দুশো বার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দু-শো বার? এত কঠিন সংযমের দরকার কী— পাঁচ-শো বার বল্‌-না।

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে?

ঠাকুরদা। নিজেও ভুলেছি ভাই!

তৃতীয়। আমরা চারি দিকে প্রচার করে বেড়াব আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলো। তোমাদের রাজা তো কারো কানে ধরে বলছেন না 'আমি আছি'। তিনি তো বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি 'রাজা নেই'— যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে করুক-না।

ঠাকুরদা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে?

ঠাকুরদা। ওরে, তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে— আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল, একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুরদা। তবে কী রে! ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব? এমনি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই! তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর্! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কী রকম দেখো-না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্-না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি, আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে! তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনোদিন পুরস্কার দেয়? তা যা ভাই, আনন্দ করে বলে বেড়া গে রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব— সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে !
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন-কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

৪

প্রাসাদশিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি ?

রোহিণী। শুনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে। সেইজন্যে যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি— এই বুঝি হবে রাজা। আবার দুদিন পরে ভুল ভাঙে।

সুদর্শনা। ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না। আমি হলুম রানী। ঐ তো আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন ?

সুদর্শনা। ঐ মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো ?

রোহিণী। এসেছি বৈকি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে— রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা ?

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস ?

রোহিণী। হাঁ, ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প, তাই ভয় হয় কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা। আহা, যদি সুরঙ্গমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। সুরঙ্গমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!

সুদর্শনা। তা যা বলিস, সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ কথা আমি কক্‌খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম, তা হলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

সুদর্শনা। না না, সে তো বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরো বেশি। কত ছলই যে জানে। ঐজন্যেই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হোক, সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না, আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রঙ্গ দেখে হেসে বাঁচি নে।

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম, তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী। যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহভঞ্জন হোক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে'ই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না— তবু কথাটা সকলেরই মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে— ঐ দেখো-না, তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর্‌। পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন কে দিলে ?

সুদর্শনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না— তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব না— ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে— এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারি দিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো, বসন্ত, যে-সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না— ওরে প্রতিহারী !

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী !

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে— ডাক্‌ ডাক্‌, ওদের ডেকে নিয়ে আয়— একটু গান শুনি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) ভগবান্‌ চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ। তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে— কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই— আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি। ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারি দিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

বালকগণের প্রবেশ

এসো এসো, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে, অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান

বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমানিশা
অধীর অদর্শনতৃষা
কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে।
সুদূরের সুগন্ধধারা
বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা
ঘুরে মরে।
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে।

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে। আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই— তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো— ইচ্ছে করছে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই— হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো। আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা— এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে— তোমরা যে ফুলের মালা পরেছওর মতো কিছুই আমার কাছে নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা। ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী! তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনতে আমার লজ্জা করছে। এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি— যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। তবু বল্, কী হল বল্।

রোহিণী। আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম, কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হল না।

সুদর্শনা। বলিস কী! তিনি বুঝতে পারলেন না?

রোহিণী। না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে পুতুলটির মতো বসে রইলেন। কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি! আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেমনি শাস্তি হয়েছে। তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আনলি নে কেন?

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে? পাশে ছিলেন কাঞ্চীর রাজা, তিনি খুব চতুর— চকিতে সমস্ত বুঝতে পারলেন— মুচকে হেসে বললেন, 'মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্তসখার পূজার পুষ্পে মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন।' শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, 'আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হল।' আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিলুম এমন সময়ে কাঞ্চীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, 'সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।'

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হল! আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে। তা হোক, যা তুই যা, আমি একটু একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে, তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না— পরাভব, সর্বত্রই পরাভব— বিমুখ হয়ে থাকব সে শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে ঐ মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে! রোহিণী!

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী?

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য?

রোহিণী। তোমার কাছে না হোক, যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না না, ওকে দেওয়া বলে না, ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্ধা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে, ওটা খুলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম— এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল— পারলুম না। এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে, তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসবদেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম— এই অগৌরবের মালা!

৫

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা! এই দেখো-না, একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী! রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে নাকি ?

দ্বিতীয়। ওরে বাস রে! কাছে ঘেঁষে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায়, বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রঙ ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসন-দণ্ড— ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস বুঝি ?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না।

ঠাকুরদা। এখনো ডাক পড়ল না— দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শম্ভু-সুধন'রা সব গেল কোথায় ?

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল, শুতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সঙ্গে অমন খাড়া জাগতে পারে।

[প্রস্থান

বাউলের দল

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হল বসন ভূষণ
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হ'ল কেমন দেখ্ রে— যেমন
রাঙা কমল টলমল।

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ— খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল! কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে— সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তা হলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি-চুপি ও যে আজ কত রঙ ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?

কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
      রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?
তুমি সাধ করে, নাথ, ধরা দিয়ে
      আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
      রাঙাবে ওই উত্তরীয়।

[প্রস্থান

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা। ওমা! ওমা! যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো।

দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথমা। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই ?

ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্যে।

তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি ?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
      সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
      পথে যে-জন ভাসায়।

দ্বিতীয়া। আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে

দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী!

ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে ধরা দেওয়াও যা, ছাড়া পাওয়াও তা।

যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল, কিন্তু মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইছে না— তোরা তো বাড়ি চলেছিস, তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন।
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন।
তোমার তালে আমার চরণ চলে,
শুনতে না পাই কে কী বলে—
তাধিন তাধিন।
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্‌
পাগল ছিল সেই জেগেছে—
তাধিন তাধিন।

আমার   লাজের বাঁধন, সাজের বাঁধন,

খসে গেল ভজন সাধন—

তাধিন তাধিন।

বিষম   নাচের বেগে দোলা লেগে

ভাবনা যত সব ভেগেছে—

তাধিন তাধিন।

[নাচের দলের প্রস্থান

স্বরঙ্গমার প্রবেশ

স্বরঙ্গমা। এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা?

ঠাকুরদা। দ্বারের কাজে ছিলুম।

স্বরঙ্গমা। সে কাজ তো শেষ হল। একটি মানুষও নেই— সবাই চলে গেছে।

ঠাকুরদা। এবার তবে ভিতরে চলি।

স্বরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

স্বরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর বাঁশি কারো বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না, তা না হলে লজ্জায় আর-সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।

স্বরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা! এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই!

সুরঙ্গমা। তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে? রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে, আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।

গান

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে!
মাতিল আকুল দক্ষিণবায়ু
সৌরভচঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥
কাটিল ক্লান্ত বসন্তনিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী-সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে ভবনে—
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেইরকম কোরো। ভুল না হয়।

রাজবেশী। ভুল হবে না।

কাঞ্চী। করভোগ্যানের মধ্যেই রানীর প্রাসাদ ?

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কাঞ্চী। সেই উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেবে— তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

রাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ডরাজ আমার, কেবলই মনে হচ্ছে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলছি, এ দেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে, সত্য হোক - মিথ্যে হোক, একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগ-স্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে এই হিতকার্যটা নিজেই করব। (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে, কে তুমি ? কোথায় লুকিয়ে ছিলে ?

ঠাকুরদা। লুকিয়ে থাকি নি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি।

রাজবেশী। ইনি এ দেশের রাজাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, নির্বোধেরা বিশ্বাস করে।

ঠাকুরদা। বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ ?

ঠাকুরদা। আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে।

ঠাকুরদা। আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল?

কাঞ্চী। বিড়্ বিড়্ করে বকছ কী?

ঠাকুরদা। আমি বলছি দেশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই বুঝি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল নাকি?

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো— বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে সে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোদ্যান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী! কিছু তো বুঝতে পারছি নে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস ?

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস ?

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোন্ রাজা ?

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি ?

প্রথম মালী। হাঁ সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব।

[প্রস্থান

রোহিণী। এরা কী বলে বুঝতে পারি নে— ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন, কিন্তু কোথায় কিছুই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি।

[প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে! শীঘ্র একটা দুর্দৈব ঘটবে। আমাকে সুদ্ধ জড়াবে না তো?

অবন্তীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান?

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়?

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। সখী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান?

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল?

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তারা বললে রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন্ রাজা?

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

অবন্তী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হোক এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

[দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাঁধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিষ্কৃতি নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম তখন তিনি তো এক রকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন— তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই পুরস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরো বাড়ছে। এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন? এখন তো এদের ওড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ওদিকে দৌড়ল কোথায়? চপলা! চপলা! আমার ডাক শুনলই না। এমন তো কখনোই হয় না। চার দিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মতো হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে! যেন চার দিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্মত্ততা আজ! ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই!

৭

রানীর প্রাসাদদ্বার

রাজবেশী। এ কী কাণ্ড করেছ কাঞ্চীরাজ!

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চার দিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাঞ্চী। তুমি তো এ দেশের লোক— পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী! ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা, রক্ষা করো! চার দিকে আগুন!

কাঞ্চী। মূঢ় ওঠ্, আর দেরি না।

সুদর্শনা। (প্রবেশ করিয়া) রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।

[কাঞ্চীরাজের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়! এ রাজা নয়! তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে—আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব—হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) রানী, ও দিকে কোথায় যাও? তোমার অন্তঃপুরের চার দিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবারই আগুন।

প্রাসাদে প্রবেশ

৮

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই— কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

রাজা। হতাশ হোয়ো না রানী!

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা— আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তো ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চার দিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে 'ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব'। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম! আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা!

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম! কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী ?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি, যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে মনে ক'রে আমার কাছ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে, রানী, হবে। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে, সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের ?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ-ভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
সোহাগ আমার মালা করে
গলায় তোমার পরাব।
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব।

সুদর্শনা। হবে না, হবে না— শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে! আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে —সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপন-সুদ্ধ ঝল্‌মল্ করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বললুম, এখন আমাকে শাস্তি দাও।

রাজা। শাস্তি শুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেখো।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না— তোমাকে আমি সইতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি

আমাকে— জানি নে আমাকে তুমি কী করেছ! কিন্তু কেন তুমি এমনতরো? কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি— তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্‌বুদের মতো শূন্য।

সুদর্শনা। তা হোক, কিন্তু আমি পারছি নে— তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে! আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্য দিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করছি— কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরো বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে দূরে চলে যাই— এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা, তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না ব'লেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দ্বিধা হয়। তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও-না কেন? তুমি আমাকে মারো না-কেন? মারো, মারো, আমাকে মারো। তুমি আমাকে কিছু বলছ না, সেইজন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। কিছু বলছি নে কে তোমাকে বললে।

সুদর্শনা। অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীৎকার করে বলো—

বজ্রগর্জনে বলো— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো— আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

রাজা। ছেড়ে দেব, কিন্তু যেতে দেব কেন?

সুদর্শনা। যেতে দেবে না? আমি যাবই।

রাজা। আচ্ছা, যাও।

সুদর্শনা। দেখো, তা হলে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে, কিন্তু রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না— আমি চললুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে— এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান

সুরঙ্গমার

প্রবেশ ও গান

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ!
কঠিন করে চরণ-'পরে
প্রণত করো মন।
বেঁধেছ মোরে নিত্যকাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে,
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।

এসো হে, ওহে আকস্মিক,
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক—
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক
নিমেষে এ জীবন।
তাহার পরে প্রকাশ হোক
উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন।

সুদর্শনা। (পুনঃ প্রবেশ করিয়া) রাজা! রাজা!

সুরঙ্গমা। তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শনা। চলে গেছেন? আচ্ছা বেশ, তা হলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম, কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আচ্ছা, ভালোই হল— তা হলে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা, আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা। কেনই বা বলবেন? বলবার তো কথা নয়। তা হলে আমি মুক্ত। আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম, কিন্তু মুখে বেধে গেল। বল্ দেখি, বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন?

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তা হলে ওদের কী হল?

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার

করে দেশে ফিরে গেছেন।

স্নদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

স্নরঙ্গমা। রানীমা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

স্নদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করেছিস? রাজার কাছ থেকে এ পর্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব— এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না।

স্নরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি।

স্নদর্শনা। তবে তুই কী চাস?

স্নরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

স্নদর্শনা। কী বলিস তুই? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা!

স্নরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন।

স্নদর্শনা। পাগলের মতো বকিস নে। আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম, সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস?

স্নরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব— সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

স্নদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না— তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে— সে আমি সইতে পারব না।

স্নরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি— আমাকে পর করে রাখতে পারবে না— আমি যাবই।—

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী,
আমি সকল দাগে হব দাগি।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন—
যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ওই চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি।

৯

সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

কান্যকুব্জ। সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে? অন্ধকার হোক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তার বাসের ব্যবস্থা করে দিই?

কান্যকুব্জ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে— এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

কান্যকুব্জ। যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তা হলে পিতা নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুব্জ। সে যে আমার কন্যা এ কথা যেন প্রকাশ না হয়— তা হলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে।

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ?

কান্যকুব্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি— সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে— আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে— তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস, ওতে আমার আরো রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা?

সুদর্শনা। সে আমি জানি নে— কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে সমস্ত ছারখার হয়ে যাক। অতবড়ো রানীর পদ এক মুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে? মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া? সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না?

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁয়ায়— এখনো সময় যায় নি।

সুদর্শনা। রানীর মহিমা ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এলুম, এখানে আর কেউ নেই যে আমার সঙ্গে মিলবে। একলা— একলা আমি। আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্যে কেউ এক পা'ও বাড়াবে না?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না— একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারি নি— ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস

জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা। আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি না কেন?

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগুন লাগায় নি— আগুন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

সুদর্শনা। ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ— তার ভিতরে মানুষ নেই! এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা! কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনো ফেরাবার জন্যে আসে? (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! কখনো না! রাজা এলেও আমি ফিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না! চলে যাবার দ্বার একেবারে খোলা রইল। বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রানী বলে আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষুকও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি! চুপ করে রইলি যে? বল্-না তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে— আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এই রকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে— আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ্ তো, ঐ মাঠের পারে পূর্বদিগন্তে যেন ধুলো উড়ছে।

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই তো দেখছি।

সুদর্শনা। ঐ-যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাচ্ছে না?

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে! তবে তো এল!

সুরঙ্গমা। কে আসছে?

সুদর্শনা। আবার কে? তোর রাজা। থাকতে পারবে কেন? এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য।

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। না বৈকি। তুমি তো সব জান। ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছুতেই টলেন না! দেখি কেমন না টলেন। আমি জানতুম সে ছুটে আসবে। কিন্তু মনে রাখিস, সুরঙ্গমা, আমি তাকে একদিনের জন্যেও ডাকি নি। আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সুরঙ্গমা, যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই বুঝি যাব? কখনো না। আমি যাব না। যাব না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। নয়! তুই সত্যি বলছিস! এখনো আমাকে নিতে এল না!

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

সুদর্শনা। এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেই আসছে।

সুদর্শনা। তার নাম কী জানিস?

সুরঙ্গমা। তার নাম সুবর্ণ।

সুদর্শনা। তবে তো সে আসছে। ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। সুবর্ণকে তুই জানতিস?

সুরঙ্গমা। যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

সুদর্শনা। না না, তোর মুখে আমি তার কোনো কথা শুনতে চাই নে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা। তার পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল্ তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না। আচ্ছা, সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস?

সুরঙ্গমার গান

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি?
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী॥

১১

শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুব্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে আসি নি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যেই অপেক্ষা।

দূত। মহারাজ স্মরণ রাখবেন রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তার আশ্রয়।

দূত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দূত। জীবন থাকতে সে সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না— মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না, কারণ তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন্!

সুবর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাকবে!

সুবর্ণ। এমন কাপুরুষ আমি না।

দূত। এ যদি আপনাদের পরিহাসবাক্য না হয় তা হলে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের।

কাঞ্চী। রাজন্!

সুবর্ণ। কী মহারাজ!

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

সুবর্ণ। এও কি কখনো হয়?

দূত। তবে কী ইচ্ছা করেন।

কাঞ্চী। সেও কি বলতে হবে?

সুবর্ণ। তা তো বটেই। সে তো বুঝতেই পারছেন।

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব, এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি এই কথা রাজাকে জানাও গে।

[দূতের প্রস্থান

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে— কিন্তু—

কাঞ্চী। কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি, মহারাজ, ঐ কিন্তুটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ঐ কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন-না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাঁকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম— কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই ভবে বাঁচন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্যে আসছেন সংবাদ পেলুম।

[প্রস্থান

কাঞ্চী। যা ভয় করছিলুম তাই হল। সুদর্শনার পলায়ন-সংবাদ রটে গিয়েছে— এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বলছি আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাঞ্চী। কেন? তাতে তাঁর লাভ কী।

সুবর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে মরবে— মাঝের থেকে যাঁর ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাঞ্চী। এখন বেশ বুঝছি কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে সর্বত্রই দেখা যাবে এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনো আমি বলছি তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ, আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে— তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভ-রাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ওপারে।

[প্রস্থান

কাঞ্চী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক তার পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ঐ উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি— আমি অতি হীনব্যক্তি— আমার দ্বারা—

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সিঁড়ি বল, রাস্তা বল, পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয় তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে, কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি, মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থটাই বুঝে নেন।

কাঞ্চী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্ত্রী না করে গোয়ালঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে— সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তা হলে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যুদ্ধ এখনো চলছে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ, এখনো চলছে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি— ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ করে দিই। সত্যিই যদি তাই করতেন ভালো হত। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কী মা!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তা হলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারো বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তা হলে সকলকেই নির্বাক্ হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছুই বুঝি নে জানি, সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ তো।

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

সুদর্শনা। আর কেউ না ?

সুরঙ্গমা। সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল— কাঞ্চীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন।

সুদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আসতে তা হলে তোমার যশ বাড়ত

বে কমত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন ?

সুরঙ্গমা। সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা, ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্তেই ভয়, নইলে একলার জন্তে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। দেখ্‌ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

সুরঙ্গমা। তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে।

সুরঙ্গমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আর বাজায়।

সুদর্শনা। তা হবে! কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর-ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান, তানের পর তান, ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্‌ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্‌ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। আহা মা, সে কী অন্ধকার! সেই অন্ধকারের দাসী আমি।

সুদর্শনা। আমার জন্তে সেখান থেকে তুই কেন এলি ?

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্তে।

সুদর্শনা। না না, তিনি আসবেন না— তিনি আমাদের একেবারে

ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন! অপরাধ তো কম করি নি।

সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তা হলে তাঁকে আর দরকার নেই। তা হলে তিনি নেই। তা হলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য— তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি— কেউ ডাকে নি— সমস্ত বঞ্চনা।

দ্বারীর প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি?

দ্বারী। আমি এই প্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। কী খবর শীঘ্র বলো।

দ্বারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। বন্দী হয়েছেন? মা গো বসুন্ধরা!

মূর্ছা

১৩

বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল ?

কলিঙ্গ। কই শেষ হল ? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না ?

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্তমাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধুলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু, মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবি মেটাবেন কী করে।

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবি তো রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কী পরিষ্কার করেই বলো।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ম্বরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন— আমাকে জীবিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক দুঃখ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে প্রস্তাব করলেন তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ম্বরের দিন স্থির হোক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাঞ্চী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ!

সুবর্ণ। কী আদেশ?

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

সুবর্ণ। কিংকর প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম। রানী সুদর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনো তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ করে নি দেখছি। যাই হোক, তিনি তো রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না, অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না। অতএব যেমন করেই হোক এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই যে-সব অমূলক কল্পনা করছেন

এ অতি ভয়ানক কল্পনা— দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না— আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তা হলে স্বয়ম্বরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা। তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক্, ধিক্ আমাকে!

সুরঙ্গমা। সেইসঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বললে, 'তোমার রানীকে বোলো বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।'

সুদর্শনা। চুপ কর্! চুপ কর্! আমাকে আর দগ্ধ করিস নে।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ঐ যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই কেবল মুকুটে একটি ফুলের মালা জড়ানো উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ঐ সুবর্ণ! তুই সত্যি বলছিস!

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বলছি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না! সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর-একটা কী দেখেছিলুম। ও নয়, ও নয়!

সুরঙ্গমা। সকলে তো বলে ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।

সুদর্শনা। ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে!

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন?

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী। (প্রবেশ করিয়া) স্বয়ম্বরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরখানা নিয়ে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ, উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না! (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি, বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু! সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু, আসুক—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর—তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে—

সে তুমিই, সে তুমি !—

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী !
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী !
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ওই চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী !
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে,
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী !
সকল ঝ'রে সকল ভ'রে আসুক সে চরম—
ওগো মরুক-না এই আমি॥

১৫

স্বয়ম্বরসভা

রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি।

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই বলে। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লজ্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহ্যশোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণ বর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাঞ্চাল। সেটা কি উনি ভালো করছেন? সকলেই জানে রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো— আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে?

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই ফল মধুর হয়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ বয়সে বারম্বার আশাকে ত্যাগ

করলেও সে প্রগল্‌ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে— আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ না'ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে?

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম, দৈবজ্ঞ বলেছিল যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বৈ ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ কোশলরাজ! ফল ত্যাগ করাবার জন্যে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল।

কোশল। ছিল বৈকি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প নাকি?

কাঞ্চী। ভূমিকম্প? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হতে পারে, কিন্তু তা হলে তো দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ!

বিদর্ভ। অদৃষ্টপুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্যে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ো না।

কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকবে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যেন একটা—

কাঞ্চী। ঐ যেন-একটার কথা তুলবেন না— ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।

কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি?

পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্ছে।

কাঞ্চী। তবে আর কি— নিশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন— এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ, অমনতরো সংকুচিত হয়ে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপছে যে।

যোদ্ধৃবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙ্গ। ও কী ও? ও কে?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে?

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়। কলিঙ্গরাজ তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক-না কী বলে।

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা?

পাঞ্চাল। কোন্ রাজা?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা?

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা?

কলিঙ্গ। কে?

কোশল। কে সে?

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়?

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস্! আহ্বান! কীভাবে আহ্বান করেছেন?

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই— সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি— তুমি আবার সেনাপতি!

ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে! তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন— বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব— কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ, আমরা আপনারই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো তোমার রাজছত্র ধুলায় লুটোচ্ছে; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি, রাজদূত— কিন্তু সভায় নয়, রণ-ক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে'ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাল্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্ছি— শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে, এখন ভীরুতা করে সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করছে?

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন ?

সুরঙ্গমা। তা তো বলতে পারি নে—পথ চেয়ে বসে আছি।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে বেদনা বোধ হচ্ছে। লজ্জাতেও মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাব কেমন করে !

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও, তা হলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে—কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কিনা, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বলত আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই—সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রানীমা ! কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া। সুরঙ্গমা, সেই আশীর্বাদ কর্‌ যেন—

সুরঙ্গমা। কী বল তুমি! আমি আশীর্বাদ করব কিসের!

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে নুইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে— সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু, কই, রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি আমার রাজা নিষ্ঠুর— বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি— তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু— আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী— কর কী রানী! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও— আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন।

ঠাকুরদা। ঐ তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী! যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন!

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন! তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে, সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন! ওরে, ওরে কী কঠিন! কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি— বুক ফেটে গেল— কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে!

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে— সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি— এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বৈকি— নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন! ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। এই জানলার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব— এক পা নড়ব না— দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি, তোমার বয়স অল্প— জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার— কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে তাকে চাই নে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে! কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তা হলে এমন করে

দেখাতেন কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখালেন আর কই ?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা— তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না ? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল ?

১৭

নাগরিকদল

প্রথম। ওহে, এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে— কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না? ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল— কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়— কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে!

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি— ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল লড়াই করে মরব আমি আর তার ফল ভোগ করবে আর-কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল, কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে

হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এ জন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি— সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল ?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে, কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ঐ কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তার লেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তা হলে কাঞ্চীকে কি আর আস্ত রাখতুম। ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই, মস্ত মস্ত বিচারকর্তা— ওদের বুদ্ধি এক রকমের।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি! ওদের সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তা হলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে!

১৮

পথ

ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ, তুমি পথে যে!

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ঐ তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি—তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হোক, সে যত বড়ো রাজাই হোক, হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে?

কাঞ্চী। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তা হলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো?

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি— আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর-কি। এখন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে?

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানা ক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল— রণক্ষেত্রেও মন্দ জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর্‌ তো রে ভাই, তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর্‌।

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে,
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,

এই সংগীতমুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।
অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে।
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে—
এই সৌরভবিহ্বলা রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে!
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে!

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে— আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি— দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে— সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা, কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে— তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে! বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল— কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল— পথে বের করলে তবে ছাড়লে।

মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব, চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি— কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল, নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল— আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে— অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে— এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে— এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা— এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন— আমার হাত ধরেছেন— সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন— হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত— এও সেইরকম। কে বললে তিনি নেই? সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু-চরণপাতে?
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি—
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।

যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্, সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না মা!

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ। (প্রবেশ করিয়া) মা, তুমিও চলেছ বুঝি? আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ— আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল— আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কাঞ্চী। কিন্তু, মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তা হলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা বোলো না— যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ

থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি— আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। রানীমা, ঐ দেখো, পূর্ব দিকে চেয়ে দেখো, ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা— তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে
উঠে আলোকেরই গান।
ধন্য হলি ওরে পান্থ, রজনী জাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি
ধুলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে সমীরণ জাগিয়াছে।
মধুভিক্ষু সারে সারে আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা, মোছ মোছ অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি
ঘুচিল রে অভিমান॥

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি, ঠাকুরদা, পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই!

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ঐ-যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হোক। আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক, আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে— আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না! সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন— সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন— বেঁচেছি বেঁচেছি— আমি আজ তাঁর দাসী— যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক— তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক— ফুলের রেণু এখন থাক্, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে

মনে করছ ? যে পায় তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে— সে ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে, যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই! যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে— এখন দেখতে দেখতে রঙ ফিরে যাবে।— আর এই আমাদের রানীকে দেখো— ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল— মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে— কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে— সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই— তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে— আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ করছে।

সুরঙ্গমা। ঐ-যে সূর্য উঠল!

২০

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে ?

সুদর্শনা। পারব, রাজা, পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে— তুমি সুন্দর নও, প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও— সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম— এখানকার লীলা শেষ হল। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো— আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

—

গ্রন্থপরিচয়

রাজা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১৩১৭ সালের পৌষ মাসে রাজা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'লেখকের নিবেদন' হইতে জানি "এই 'রাজা' প্রথমে পাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া [প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়ত তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।" এই সংস্করণই তদবধি প্রচলিত। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই বা প্রকাশিত হয় নাই— শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। অরূপরতন (মাঘ ১৩২৬) "নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ— নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" "যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত[১] তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল[২]।"

"আমার ধর্ম"[৩] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনা করিয়াছেন—

'রাজা' নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তার পরে সেই

১ দ্রষ্টব্য, Rajendralala Mitra, "Story of Kus'a", *The Sanskrit Buddhist Story of Nepal*, pp. 142-45.

২ পৌষ ১৩৩৮। পুনশ্চ গ্রন্থে সংকলিত।

৩ আত্মপরিচয় গ্রন্থে তৃতীয় প্রবন্ধে সংকলিত।

ভুলের মধ্যে দিয়ে, পাপের মধ্যে দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা সৃষ্টি করছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, তাতেই আনন্দ।"

অরূপরতনের ভূমিকায় (মাঘ ১৩২৬) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধন জন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল— অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না; নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারি দিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল— সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া

পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে সকল কালে— আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়— এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।"

রাজা নাটকের অনুবাদ *The King of the Dark Chamber* (1914) পুস্তকের কোনো সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সি. এফ. এণ্ড্রুজ মহাশয়কে এক পত্রে[৪] লেখেন—

CALCUTTA, *November 15th*, 1914

Critics and detectives are naturally suspicious. They scent allegories and bombs where there are no such abominations. It is difficult to convince them of our innocence.

With regard to the criticism of my play, *The King of the Dark Chamber*, that you mention in your letter, the human soul has its inner drama, which is just the same as anything else that concerns Man, and Sudarsana is not more an abstraction than Lady Macbeth, who might be described as an allegory representing the criminal ambition in man's nature. However it does not matter what things are, according to the rule of the critics. They are what they are, and therefore difficult of classification... .

৪ রবীন্দ্রনাথের *Letters to a Friend* গ্রন্থে সংকলিত।

মূল্য ১৬.০০ টাকা